দৈনিক জনকণ্ঠ

প্রকাশিত : ৩ আগস্ট ২০১৬

রামপাল বিদ্যুত কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলন

বিভ্রান্তিই হাতিয়ার

- দুজন জামায়াতপন্থী শিক্ষক এ আন্দোলন শুরু করেন
- পরিবেশবাদীরা জনগণকে সঠিক নয় এমন তথ্যই দিচ্ছে, বাস্তবের সঙ্গে যার কোন মিল নেই

রশিদ মামুন || বিভ্রান্তিই রামপাল আন্দোলনের বড় হাতিয়ার। দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক এই হাতিয়ার তুলে দিয়েছে পরিবেশবাদীদের হাতে। শুরুতে পরিবেশ বিষয়টিকে সামনে রেখে রামপাল প্রকল্পের বিরোধিতা করলেও পরিবেশবাদীরা সম্প্রতি তাদের ইস্যুকে বিস্তৃত করেছে। সম্প্রতি রামপাল বিদ্যুত কেন্দ্রের কর অবকাশ এবং কম সুদে ভারতীয় ঋণ পাওয়ায় ওই দেশের জনগণের ক্ষতির বিষয়টি সামনে এনেছে আন্দোলনকারীরা। যেসব ইস্যুকে সামনে রেখে আন্দোলন করা হচ্ছে তার সব কটির বিষয়ে বিদ্যুত কেন্দ্রটির নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ কোম্পানি) তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করলেও মানতে নারাজ পরিবেশবাদীরা। সম্প্রতি সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসেও তারা একই মনোভাব ব্যক্ত করেন। দুই পক্ষের অনড় অবস্থানের মধ্যে রামপাল বিদ্যুত কেন্দ্রের চুক্তি হয়। এরপরও মাঠের আন্দোলনকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করছে পরিবেশবাদীরা।

বিদ্যুত উৎপাদনের বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সহজলভ্য ধরা হচ্ছে কয়লাকে। সরকার মনে করছে কয়লায় বিদ্যুত উৎপাদন করলে দাম সাধ্যের মধ্যে থাকবে। অন্যদিকে তেলের বাজার সব সময় অস্থিতিশীল। ৩০ বছরে তেলের বাজারের

অস্থিতিশীলতায় মূল্যস্ফীতি বেড়েছে বহুগুণ। দেশের স্থিতিশীল বিদ্যুত ব্যবস্থার জন্য বড় আকারের বিদ্যুত কেন্দ্র স্থাপনের কোন বিকল্প নেই। আর এসব বিদ্যুত কেন্দ্রের জ্বালানি হিসেবে কয়লা অথবা পরমাণুকে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশ দুই দশমিক ০৫ ভাগ বিদ্যুত কয়লা থেকে উৎপাদন করে। অন্যদিকে বিশ্বে গড়ে ৪১ ভাগ বিদ্যুত উৎপাদন হয় কয়লা থেকে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র মোট বিদ্যুত উৎপাদনের ৪৯ দশমিক ১ ভাগ, চীন ৭৮ দশমিক ৯ ভাগ, দক্ষিণ আফ্রিকা ৯৩ ভাগ, অস্ট্রেলিয়া ৭৮ ভাগ, জাপান ২৬ দশমিক ৮ ভাগ, ভারত ৬৮ ভাগ, পাকিস্তান ছয় ভাগ বিদ্যুত কয়লা থেকে উৎপাদন করে।

দুটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন পরিবেশ বিজ্ঞানের শিক্ষক শুরুতেই রামপাল ইস্যুতে বিভ্রান্তিকর গবেষণা প্রতিবেদন দিয়ে পরিবেশবাদীদের উস্কানি দেন। এই দুই শিক্ষকই জামায়াতপন্থী। ২০১৩ সালের শুরুতে মূলত রামপাল বিদ্যুত কেন্দ্রের মাধ্যমে সুন্দরবন ধ্বংস করা হচ্ছে এমন গবেষণাপত্র নিয়ে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করতে আসেন ড. আব্দুল্লাহ হারুন চৌধুরী। তখন থেকেই রামপাল ইস্যুতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলে পরিবেশবাদীরা। সরকার সুন্দরবন ধ্বংস করে দিচ্ছে; ব্যাপকভাবে তা মানুষের মধ্যে প্রচার করার পাশাপাশি ভারতবিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগানোর চেষ্টায় ওই গবেষণা করা হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০১৪ এর নির্বাচনে বিরোধীপক্ষের ঘরে এর সুফল তুলে দিতে এই কৌশলের আশ্রয় নেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষক। জাতীয় প্রেসক্লাবে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করতে আসা আব্দুল্লাহ হারুন চৌধুরী এক বছরের কঠোর পরিশ্রমে গবেষণাপত্রটির কাজ শেষ হয়েছে জানালেও বলতে পারেননি কোন্ প্রযুক্তিতে সরকার বিদ্যুত কেন্দ্রটি নির্মাণ করবে। তিনি ওই সময় জানান, বিদ্যুত কেন্দ্রটি কোন্ প্রযুক্তিতে নির্মাণ করা হচ্ছে তা সরকার তখনও প্রকাশ করেনি। তবে ওই সময়ের অন্তত এক বছর আগে বিদ্যুত কেন্দ্রটির প্রযুক্তি কি হবে তার ঘোষণা দেয় সরকার। বিশ্বের সর্বাধুনিক সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তিতে বিদ্যুত কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হচ্ছে। এর আগে রামপাল ইস্যুতে প্রথম বিভ্রান্তি ছড়ায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুস সত্তার। তিনি এবং তার সহকর্মীরা ইন্টারনেট ঘেটে পাওয়া তথ্য দিয়ে ওই গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। দুটি গবেষণায় প্রতিদিন এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট কয়লাবিদ্যুত কেন্দ্রের জন্য কি পরিমাণ কয়লা পোড়ানো হবে, এতে কি পরিমাণ ছাই এবং কার্বন নিঃসরণ হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে কিভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে তার কোন উল্লেখ নেই। কীভাবে সরকারী চাকরি করে বিভ্রান্তি ছড়ান এই দুই শিক্ষক তা নিয়ে বিদ্যুত বিভাগ কোন সময় মাথা ঘামায়নি। ওই দুই শিক্ষক কোন্ তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণা করল তাও কোনদিন জানতে চাওয়া হয়নি। অথচ বিভ্রান্তি দূর এবং কয়লা চালিত বিদ্যুত কেন্দ্রের পক্ষে প্রচারের জন্য একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। যদিও রামপাল ইস্যুতে সরকার পরিবেশবাদীদের সঙ্গে দু'বার বৈঠক করেছে। একবার ক'জন পরিবেশবাদীকে রামপাল এলাকা ঘুরিয়ে আনে। সরকারের পক্ষ থেকে দেশের বাইরে একই ধরনের বিদ্যুত কেন্দ্র দেখিয়ে আনার প্রস্তাব দিলেও পরিবেশবাদীরা তা গ্রহণ করেননি। পরিবেশবাদীরা বলছেন, খালি চোখে দেখে কয়লাবিদ্যুত কেন্দ্রের ক্ষতির প্রভাব বোঝা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন সময়ে দেয়া পরিবেশবাদীদের বক্তব্য এবং সরকারের ভাষ্য এবং বিদ্যুত কেন্দ্রটির পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন ঘেটে রাপমাল সম্পর্কে গোজামিলের তথ্য দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

স্থান ॥ পরিবেশবাদীরা দাবি করছে সুন্দরবনের মধ্যে বিদ্যুত কেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে। তারা বলার চেষ্টা করছে সুন্দরবন থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে বিদ্যুত কেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে, যা দেশের পরিŸেশ আইন অনুযায়ী করা ঠিক নয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, বিদ্যুত কেন্দ্রটি সুন্দরবনের ১৪ কিলেমিটার দূরে স্থাপন করা হচ্ছে। বাফার জোনের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন না করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিদ্যুত কেন্দ্রটি বাফার জোন থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে। ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য থেকে ৬৯ দশমিক ৬ কিলোমিটার দূরে। শুধু পরিবেশবাদীদের সুরে সুর মিলিয়েছে বিএনপি। গত শুক্রবার দলটির তরফ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে বলা হয়েছেÑ সরকার সুন্দরবনের মধ্যে রামপাল বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণ করছে। এর আগে বিএনপিপন্থী বুদ্ধিজীবী ড. এমাজ উদ্দীন বলেন, সরকার ভারতের স্বার্থে এই প্রকল্প নির্মাণ করছে। পরিবেশগত বিরোধিতার পাশাপাশি সরকার এবং ভারতবিরোধিতা রামপাল ইস্যুতে কাজ করছে।

পরিবেশগত ছাড়পত্র ॥ মাঠ গরম করার জন্য পরিবেশবাদীরা সব সময় বলে থাকেন বিদ্যুত কেন্দ্রটি পরিবেশগত ছাড়পত্র পায়নি। সম্প্রতি জাতীয় সংসদে বন ও পরিবেশমন্ত্রীও একই ধরনের বক্তব্য দেন। ওই বক্তব্যের পর বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যায়। পরিবেশবাদীরা বিভ্রান্তি কাজে লাগাতে মন্ত্রীর বক্তব্য তুলে ধরেন। একই সঙ্গে পরিবেশ অধিদফতর রামপালে বিদ্যুত কেন্দ্র নিয়ে বড় আপত্তি থাকায় বিদ্যুত কেন্দ্রটির পরিবেশগত ছাড়পত্র দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। পরিবেশবাদীরা সরকারের প্রতিষ্ঠান দিয়ে বিদ্যুত কেন্দ্রের পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন করানোরও বিরুদ্ধে। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, পরিবেশগত ছাড়পত্রের বিষয়টি কয়েকটি ধাপে প্রদান করে থাকে পরিবেশ অধিদফতর। এখন পর্যন্ত যেসব কাজ শেষ হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে।

ছাই ॥ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুত কেন্দ্রটির সব থেকে আশঙ্কার বিষয় বিদ্যুত উৎপাদনের পর উড়ন্ত ছাই। পরিবেশবাদীরা বলছেন, বছরে একটি এক হাজার ৩২০ মেগাওয়াট কয়লাচালিত বিদ্যুত কেন্দ্রের জন্য ৪৭ লাখ টন কয়লা পোড়ানো হয়। এতে ৭ লাখ ৫০ হাজার টন ফ্লাই এ্যাশ এবং দুই লাখ টন বটম এ্যাশ তৈরি করবে। এই ছাইয়ে থাকা বিভিন্ন ভারি ধাতব এর মধ্যে আর্সেনিক, পারদ, সীসা, নিকেল, ভ্যানাডিয়াম, বেরিলিয়াম, ব্যারিয়াম, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সেলেনিয়াম, রেডিয়াম পরিবেশে মিশে ক্ষতি করবে। বিদ্যুত কেন্দ্রটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ কোম্পানি বলছে; বিদ্যুত কেন্দ্রটির ৯৯ দশমিক ৯ ভাগ ছাই ‘এ্যাশ হপারে’ ধরা হবে। এই ছাই স্থানীয় সিমেন্ট কারখানা এবং সিরামিক কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। স্থানীয়ভাবে বাজার জরিপ করে দেখা গেছে ছাইয়ের বড় বাজারও রয়েছে। ছাই ধরার পর তা সংরক্ষণের জন্য ২৫ একর জমির ওপর একটি সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা হবে। অর্থাৎ ছাইকে বাতাস বা পানির সঙ্গে মিশতে দেয়া হবে না; যাতে তা পরিবেশের কোন ক্ষতি করতে পারে। বিদ্যুত কেন্দ্রটিতে

২৭৫ মিটার উচ্চতার চিমনি ব্যবহার করা হবে; যা ৯০ তলা ভবনের চেয়ে বেশি উচ্চতার। বাতাসের স্তর বিবেচনা করে এই চিমনি বাতাসের ওই স্তরে দশমিক ১ ভাগের কম ছাই ছাড়া হবে। যা বিদ্যুত কেন্দ্রটির ছাই সুন্দরবনকে অতিক্রম করে সাগরে গিয়ে পড়বে।

নক্সস-সক্সস গ্যাস ॥ পরিবেশবাদীরা বলছেন, বিদ্যুত কেন্দ্রটি বছরে ৫২ হাজার টন সালফার ডাই অক্সাইড এবং ৩১ হাজার টন নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড বাতাসে ছড়াবে; যা সুন্দরবনের পরিবেশকে মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে ফেলবে। অথচ বিদ্যুত কেন্দ্রটির দরপত্রেই এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ভারতের একটি কোম্পানিকে কাজও দেয়া হয়েছে। নির্গত গ্যাস ধরতে ফ্লু গ্যাস ডিসালফারাইজার ইউনিট (এফজিডি) ব্যবহার করা হবে। এর মাধ্যমে কেন্দ্রটির ৯৬ ভাগ ফ্লু গ্যাস ধরা হবে। কেন্দ্রটির পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হচ্ছেÑ কেন্দ্রটি বাতাসে নক্স ছড়াবে ৫১ দশমিক ২ মাইক্রোগ্রাম/ প্রতি ঘন মিটার সাধারণ বাতাসে সক্স ছড়াবে ৫৩ দশমিক ৪ মাইক্রোগ্রাম (এক মাইক্রোগ্রাম অর্থ এক গ্রামের ১০ লাখ ভাগের এক ভাগ)। কিন্তু পরিবেশ অধিদফতরের অনুমোদিত মাত্রা হচ্ছে ৮০ মাইক্রোগ্রাম/ ঘনমিটার। বাতাসে যে পরিমাণ সক্স এবং নক্স ছাড়বে তা পরিবেশ অধিদফতরের অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে ৩০ মাইক্রোগ্রাম কম।

পানি ॥ আন্দোলকারীরা বলছেন, প্রতিঘন্টায় পশুর নদী থেকে ৯ হাজার ১৫০ ঘনমিটার পানি প্রত্যাহার করা হবে এবং ৫ হাজার ১৫০ ঘনমিটার পানি আবার ফেরত দেয়া হবে। এতে পানি দূষণ, লবণাক্ততা, নদীর পলি প্রবাহ, প্লাবন, জোয়ার-ভাটা, মাছ, নদীর অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের ওপর প্রভাব ফেলবে। পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী পশুর নদী থেকে পানি প্রত্যাহারের হার হবে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ (০.০৫%)। বিদ্যুত কেন্দ্রটিতে কুলিং টাওয়ার থাকবে। পানি ঠা-া করার পর তা আবার নদীতে ছাড়া হবে। এতে নদীর কোন ক্ষতি হবে না। বা প্রভাব পড়বে না। রামপালের কাছেই বঙ্গোপসাগর। এই পানি পশুর হয়ে সমুদ্রে মেশে। নদীর গভীরতাও কম নয়। ফলে বিদ্যুত কেন্দ্রটি নদীর ওপর কোন প্রভাব ফেলবে না।

শব্দ দূষণ ॥ পরিবেশবাদীরা দাবি করছেন, বিদ্যুত কেন্দ্রের কয়লা পরিবহন এবং যন্ত্রপাতি পরিবহনে শব্দ দূষণ হবে। এতে বনের স্বাভাবিক প্রজনন বিঘœত হবে। জীবজন্তুর বাসযোগ্যতা নষ্ট হবে। বিদ্যুত কেন্দ্রটি সুন্দরবন থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে। কয়লা পরিবহন করা হবে যে জায়গা দিয়ে সেখানে প্রতিদিন মংলা বন্দরে অসংখ্য জাহাজ আসে। এ ধরনের আধুনিক বিদ্যুত কেন্দ্রের ২০০ মিটার দূর থেকেই শব্দ শোনা যায় না। সেখানে ১৪ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত শব্দ যাওয়ার কোন আশঙ্কা নেই।

পরিবহন || পরিবেশবাদীরা আশঙ্কা করছে, খোলা জাহাজে কয়লা আসবে তাতে বাতাসে কয়লা থেকে ছাই ছড়াবে। কয়লা বিদ্যুত কেন্দ্রে নেয়ার সময় তা পানিতে পড়বে এতে পরিবেশের ক্ষতি হবে। কিন্তু প্রকল্পের সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছেÑআকরাম পয়েন্টে মাদার ভ্যাসেল থেকে ঢাকনাযুক্ত লাইটার্জে রামপালে কয়লা আনা হবে। মংলা পোর্ট বহু বছর ধরে যে পথ ব্যবহার করে সে পথেই কয়লা আসবে। কয়লা খালাসের জন্য ভাসমান টার্মিনাল ব্যবহার (এফটিএস) করা হবে। এই টার্মিনালের নক্সা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানদ- মেনে। বিদ্যুত কেন্দ্রের ভেতরে কয়লা নেয়ার জন্য ঢাকনাযুক্ত চলন্ত বেল্ট ব্যবহার করা হবে। কয়লায় যাতে তাপের কারণে আগুন না ধরে যায় এজন্য পানিও ছিটানো হবে; যাতে কয়লা থেকে কোন ধুলাও বাতাসে ছড়াতে পারবে না।

আর্থিক ক্ষতি || রামপাল প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ১৫ বছরের জন্য কর মওকুফ করেছে, যার আর্থিক মূল্য ৯৩ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার। বিদ্যুত প্রকল্পটিতে কয়লা আনার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে নদী খনন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরে দুই কোটি ৬০ লাখ ডলার ব্যয় করতে হবে। প্রকল্পের জন্য ভারতের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এক্সিম ব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া হবে। ভারতীয় জনগণের কর থেকে ৯৮ কোটি ৮০ লাখ ডলারের ভর্তুকি দেয়া হবে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয় কয়লা রফতানি করা। বাস্তবতা হচ্ছে, সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি ও ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস এ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল এ্যানালাইসিসের (আইইইএফএ) গবেষণা প্রতিবেদনটি বিভ্রান্তিতে ভরা। শুধু রামপাল নয় আইপিপি ভিত্তিক যে কোন বিদ্যুত কেন্দ্রকেই ১৫ বছরের কর অবকাশ সুবিধা দেয়া হয়। আর এই বিষয়টি শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বব্যাপী প্রচলিত রয়েছে। নদী খননের কথা বলা হয়েছে। রামপাল প্রকল্প না বাস্তবায়ন হলেও মংলা পোর্টকে সচল রাখতে এই ড্রেজিং করতে হয়। আর ভারতীয় জনগণের আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি আরও হাস্যকর এই জন্য যেÑবড় প্রকল্পে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদের হার এমনিতেই কম। শুধু রামপাল নয় অন্য দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকেও এমন সুদের হারেই ঋণ নেয়া হয়। ভারতই যেখানে কয়লা আমদানি করে সেখানে রামপালে কিভাবে তারা কয়লা রফতানি করবে। সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, রামপালের জন্য কয়লা আমদানির দেশ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে কম সালফার যুক্ত উন্নত কয়লা আমদানি করা হবে। এ জন্য সরকার পরামর্শক নিয়োগ দিয়েছে।

বিদ্যুত, জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পটি ভারতের নয়, বাংলাদেশের। বাংলাদেশ-ভারতের দুটি প্রতিষ্ঠান এর সমান অংশীদার। এই দুই প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে গঠন করা কোম্পানির মাধ্যমে বিদ্যুত কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা কখনই বলছি না কয়লা চালিত বিদ্যুত কেন্দ্র পরিবেশের কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু এই ক্ষতির মাত্রা পরিবেশের সঙ্গে মানানসই পর্যায়ে রেখে বিদ্যুত কেন্দ্রটি যাতে নির্মাণ করা হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি। আমরা মনে করছি এটা সম্ভব। পরিবেশ আন্দোলনকারীরা রামপাল সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

অন্যদিকে পরিবেশ আন্দোলনকারীদের মধ্যে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা সুলতানা কামাল বলেন, রামপাল বিদ্যুত কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে সুলতানা কামাল বলেন, রামপাল চুক্তির দিন ১২ জুলাই পরিবেশ ও বন সংরক্ষণের ইতিহাসে এখন থেকে কলঙ্কজনক দিন হিসেবে বিবেচিত হবে। ইউনেস্কোর চূড়ান্ত প্রতিবেদন না দেখেই রামপাল বিদ্যুতকেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি করার বিষয়টি খুবই উদ্বেগের বলে মনে করেন তিনি।

সম্প্রতি রামপাল ইস্যুতে ইলেক্ট্রিক পাওয়ার রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট) প্রবাসী প্রকৌশলী আরশাদ মনসুর ১০টি বিষয়কে সুনির্দিষ্ট করে বলেছেন এসব বিষয় ঠিক থাকলে রামপাল প্রকল্পে পরিবেশের কোন ক্ষতি হবে না। তাঁর মতে রামপাল বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণে নাইট্রোজেন অক্সাইড নিঃসরণের হার কমানোর লক্ষ্যে এসসিআর (সিলেক্টিভ ক্যাটালিস্ট রিএ্যাক্টর) বা এ ধরনের অন্য প্রযুক্তি ব্যবহার, রামপাল বিদ্যুত কেন্দ্রে এফজিডি (ফ্লু-গ্যাস ডিসালফারাইজার্স) অথবা সালফার অক্সাইডের নিঃসরণ কমানোর প্রযুক্তি ব্যবহার, পার্টিকুলেট ম্যাটার্সের মাত্রা কমানোর জন্য ব্যাগহাউস বা ইএসপি (ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রিসিপিট্যাটর) বা অন্য কোন যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহার করা, পানি পরিশোধন প্রযুক্তির মাধ্যমে দূষিত তরল নির্গমন কমানো হবে তার মাত্রা নির্ধারণ, কয়লা থেকে উৎপন্ন ছাই শুকনো অবস্থায় ফেলার প্রযুক্তি ব্যবহার, কার্যকর অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, পার্শ্ববর্তী সামুদ্রিক প্রাণীর ওপর তাপীয় প্রভাব কমানোর প্রযুক্তি ব্যবহার করা, স্থানীয় প্রতিবেশের ওপর কয়লা আনানেয়া ও ব্যবহারের প্রভাব কমানোর ব্যবস্থা করা, বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণের জন্য পূর্ণাঙ্গ পরিবেশগত প্রভাব মোকাবেলার জন্য সমীক্ষা করার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে উত্থাপিত ১০ টি ইস্যুকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করলে রামপালের পরিবেশগত ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে।

বিদ্যুত সচিব মনোয়ার ইসলাম এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি বলেন, তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ১০টি প্রশ্ন তুলে ধরেছেন রামপাল নিয়ে যার প্রত্যেকটি বিষয়ে যথাযথভাবে নজর দেয়া হচ্ছে। সরকার কখনই সুন্দরবন ধ্বংস করতে চায় না উল্লখ করে তিনি বলেন, আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই পরিবেশ রক্ষায়।